আমরা কেন লিখব?

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013-1434

IslamHouse.com

لماذا نكتب؟

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

আমরা কেন লিখব?

এক.

মহল্লায় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কক্সবাজারের। হঠাৎ তিনি বিনা নোটিশে এলাকা ছাড়লেন। তার ব্যথায় কাতর হলাম। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টায় নাকাম হয়ে পাথরও হলাম। দু’ বছর পর সেদিন অকস্মাৎ অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলো। সালামের পর সৌম্যকান্ত মাহমুদ ভাইয়ের কণ্ঠ চিনতে খুব বেশি কষ্ট হলো না। তারপর অনেক অনুযোগ-অভিযোগের পর এলেন মূল কথায়। তিনি নাকি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে জুমার খুতবা দেন। অখ্যাত এই পত্রিকার প্রতি তার মুগ্ধতার শেষ নেই। কেবল আমার লেখা পড়তে বহু কষ্টে ঢাকার এ ম্যাগাজিন এত দূরের মফস্বলে সংগ্রহ করেন। দৈনিক আমার দেশে আমার যত লেখা ছাপা হয়েছে তার সবই তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করছেন। কচিত সমকালে লেখা প্রকাশ হলে তাও কেবল আমার জন্যই কেনেন।

দুই.

ছোটবেলার সহপাঠী জন্মজেলা বগুড়ার প্রিয় জামিল ভাইয়ের ফোন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক। কুশল বিনিময়ের পর তার বক্তব্য, ‘জানিস আজ কী ঘটনা

ঘটেছে?' বললাম, কী ঘটনা? 'আজ আমাদের এক বড় সেনা অফিসার আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি একজন ধার্মিক মানুষ। স্মার্ট এই লোকটিকে দেখলে এতটুকু বোঝার উপায় নেই যে তার ভেতরটা ঈমানের এমন সুবাসিত খামির দিয়ে নির্মিত। বললেন, আমি একটি দারুণ ওয়েব সাইটের সন্ধান পেয়েছি। সেখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও বই ডাইনলোড করে রেখেছি। চলুন আজ আপনাকে সেগুলোই দেখাব। বাসায় নিয়ে কম্পিউটার অন করে যখন লেখাগুলো দেখাতে লাগলেন, তখন আমার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমি সোল্লাসে তাঁকে জানালাম, স্যার, খুবই মজার ব্যাপার। এই লেখককে আমি চিনি। শুধু চিনি তাই নয়, সে আমার বাল্যবন্ধুও বটে। সত্যিই গর্বে আর আনন্দে তখন আমার বুকটা স্ফীত হয়ে উঠল। মজার ঘটনাটি তোকে জানাতেই এখন ফোন করা। আল্লাহ তোর কলমকে আরও শাণিত করুন।'

দয়া করে লেখার শিরোনাম দেখে কেউ শুরুর গল্পদুটিকে দোষনীয় আত্মপ্রশস্তি ভাববেন না। নিজের অনুপ্রেরণার জায়গা চেনাতে এবং অন্য কলমবন্ধুদের অনুপ্রাণিত করতেই পাঠকের ভালোবাসার দু'টি গল্প তুলে ধরলাম। আমি তো কোনো লেখকই না; লেখকদের অনুগামী মাত্র। যারা কালোত্তীর্ণ ও পাঠকপ্রিয়

লেখক তাদের কাছে এমন খুচরো গল্প নস্যি। পাঠকের ভালোবাসার এমন অনেক গল্পই তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। সত্যিকারার্থে পাঠকই লেখকের সবচে বড় প্রেরণা। প্রত্যেক মতের লেখকেরই লেখার কোনো কোনো উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সব উদ্দেশ্য ছাপিয়ে যায় এই পাঠকের ভালোলাগার বিষয়টি। হ্যা, যিনি লেখালেখিটাকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে কাজে লাগান তিনি পাঠকের প্রশংসার জন্য লিখেন না হয়তো, কিন্তু পাঠকের ভালোলাগার বার্তা তাকেও প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে। এবার মূল কথায় আসি।

মাঝেমধ্যেই নিজেকে প্রশ্ন করি কেন আমি লেখালেখি করি? লেখালেখির গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতন আত্মীয়-রক্তীয়রাও প্রশ্ন করেন এত লিখে কী হবে? আমার লেখকপরিচয়ে যে সহধর্মিনীর গর্বের শেষ নেই, তিনিও কখনো বিরক্ত হয়ে বলেন, এত কষ্ট করে, রাত জেগে, বউ-বাচ্চার সময় সংক্ষেপ করে লিখে কী হবে? এ সমাজে সত্যের মশালবাহীরা সম্মান পাওয়া তো দূরের কথা, আজকাল জীবনের নিরাপত্তাও পাচ্ছেন না। আমার মুবাল্লিগ বাবাও প্রতিবার বাড়ি গেলে বলেন, ‘দেখ, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবে না। বিদেশে থাক, যার-তার সঙ্গে তর্কে জড়াবে না। কোনো বিপদে পড়লে আমাদের বড় কোনো নেতা বা কর্তা নেই যার

কাছে দৌড়ে যাব। স্বজন থেকে দূরে নিজের সতর্কতাই নিরাপত্তার প্রধান নিয়ামক।'

আসলে আমি লিখি কেন? মনের গোপন কথা কি বলা উচিত সবাইকে? সবার সামনে এসব কথা তুলে ধরার দরকারই বা কী? ইদানীং অনেক তরুণ বন্ধুকে দেখি লেখালেখির বন্ধুর পথে পা বাড়াতে। তাদের প্রেরণা দিতে কিংবা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস জন্মাতে নিজের কথা বলা দরকার। আমি আমার মধ্য দিয়ে অন্যকে দেখি আবার অন্যের মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। ইসলামের সপক্ষে লিখলে পার্থিব লাভ-খ্যাতি মেলে না তেমন। ইসলামের সপক্ষে লিখে কারো চাটুকারিতায় পারঙ্গম হয়ে হঠাৎ কোনো পদ বাগানো বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুযোগও নেই।

আসলে আমি লিখি লেখালেখির ময়দানে সতত স্বতঃস্ফূর্ত ও সানন্দ বিচরণ করে তৃপ্তি পাই বলে। যেমন তৃপ্তি পাই তীব্র পিপাসায় এক গ্লাস শুদ্ধ শীতল পানি পেলে। নিজের পছন্দের সেরা খাবারটি সর্বোকৃষ্ট পন্থায় সামনে এলে। আনন্দচিত্তে পেটে চালান করলে। সুন্দর সুশোভিত পুষ্পকাননে সুরভিত টকটকে গোলাপ কিংবা সুবাসিত পছন্দের ফুলটি উপহার পেলে। প্রিয় জনের বহুলাকাঙ্ক্ষিত একান্ত সাক্ষাৎ পেলে। নিজের জীবনের

চেয়ে প্রিয়তর সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। অনেকদিন পর বাসায় ফিরে আদরের ধনকে কোলে নিয়ে চুমু দিলে। অনেকগুলো বাজে দিন কাটানোর পর নতুন দিনের সূচনায় একটা খুব ভালো কাজ করলে। নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিলে। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করলে। অনাথের মুখে হাসি ফোটালে। কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার আপদ বিদায় করলে। একটি লেখার তৃপ্তি এমনই বর্ণিল। এমনই বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ।

আবারও বলি, আমি লিখি মনের আনন্দে এবং প্রাণের তাগিদে। যখন কোনো মানুষকে বেপথু হতে দেখি, নশ্বর ইহকালে মজে শাশ্বত পরকাল ভুলতে দেখি, তখনই তাগাদা বোধ করি লেখার। মানুষকে আল্লাহর প্রতি ডাকার। যখন নারীকে নির্যাতিত হতে দেখি, লাঞ্ছিত হতে দেখি কোনো তরুণীকে, তখনো বোধ করি লেখার তাগিদ। নারীকে শয়তানি প্রচারণা ও অলীক ভাবনার থাবা থেকে বাঁচাতে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ হই। যখন দেখি মিডিয়া সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানায়, তিলকে তাল আর তালকে তিল বানায় তখনো উপলব্ধি করি সৎ সাংবাদিকতার প্রয়োজন। সমাজজীবনে চলতে গিয়ে যখন দেখি অসত্যের দাপট আর মিথ্যার আস্ফালন সবাই মাথা পেতে নিচ্ছে, তখনও বীর যোদ্ধার তরবারির মতো আমার কলম গর্জে উঠতে চায়।

লেখার প্রতি একজন লেখকের ভালোবাসার তুল্য অন্য কোনো ভালোবাসা হয় না। একজন লেখক জীবন চলার পথে হয়তো বাধ্য হয়ে অনেক বিষয়ে আপস করেন। কিন্তু লেখা এবং লেখালেখি নিয়ে কখনো আপস চলে না। যেমন ধরুন, কেউ একজন জাত লেখককে বলল, চলুন আপনাকে একটি চাকরি দেব, বেতন হবে দুই বা তিন লাখ টাকা। শর্ত কেবল একটা, আপনি লিখতে পারবেন না। আমি নিজের আত্মবিশ্বাস এমনকি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। লেখার প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসার কারণেই লেখকদের স্ত্রীরা লেখালেখিকে নিজের সতীনের মতো প্রতিপক্ষ ভাবেন।

প্রশ্ন হলো লিখে কেন তৃপ্তি পাই? কারণ, এটাকে আমি আমার ইবাদত মনে করি। আমার ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা বলে চর্চা করি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে বিশ্বাস করি। অনেক ভালো কাজ আছে যার অর্জন সাময়িক। কিন্তু লেখালেখির অর্জন শাশ্বত ও চলমান। এক সময় আমি মরে যাব, আমাকে মৃত্যুর খেয়ায় চড়তে হবে, তখন তো কোনো আমল করতে পারব না। মরে গেলে সালাত, সাওম ও হজ প্রভৃতি ইবাদত করতে পারব না। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর জন্য একটি বাক্য লিখে যেতে পারি। আমার একটি প্রবন্ধ, কবিতা বা বই পড়ে যদি কেউ শুভ

কাজের প্রেরণা লাভ করেন, আল্লাহর পথের পথিক হন, তবে আমি এর পুণ্য কবরে বসেই পেতে থাকব।

মৃত্যুর পর মানুষের দৈহিক আমল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে সওয়াব পৌছানোর জন্য। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. »

‘যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার সমস্ত আমলের সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি আমলের সওয়াব বন্ধ হয় না। তা হচ্ছে : (১) তার সদকায়ে জারিয়া (২) তার প্রবর্তিত এমন কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়, (৩) তার রেখে যাওয়া এমন সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে। [মুসলিম : ১৬৩১]

লেখা যেহেতু লেখকের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে তাই ভালো লেখার জন্য তিনি অনন্ত কবরে শুয়ে নেকীর ভাগিদার হতে থাকবেন। তেমনি আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, সৎ কাজে আদেশকারী তা সম্পাদনকারীর মতো। যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু

‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. »

‘নিশ্চয় সৎ কাজের পথ প্রদর্শক তা সম্পাদনকারীর অনুরূপ।’ [তিরমিযী : ২৬৭০, সহীহ]

অতএব নিজে আমল করলে তার কবুল হওয়া না হওয়া সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু আমি যদি কাউকে ভালো কাজে ডাকি, তবে এ আহ্বানের ফলে ওই কাজের কবুল নেকী পেয়ে যাব। তদুপরি আমার লেখায় যতবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের পাশে দরুদ লেখা হবে, প্রত্যেক পাঠক তা পড়ার সময় আমিও নেকীর ভাগিদার হব।

সেহেতু আমি যা লিখি, তার কোনোটাই এ উদ্দেশের বাইরে নয়। আমার প্রতিটি লেখার পেছনেই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব পালনের ইবাদতচেতনা লুকিয়ে থাকে।

পৃথিবীর আর সব লেখক থেকে আমার বা আমার সহযোদ্ধাদের একটি বিষয়ের ভিন্নতা উল্লেখ করার মতো। একজন লেখক যদি তার ক্যারিয়ারে প্রতিষ্ঠা না পান তবে তার সাধনাকে কেউ কেউ বিফল গণ্য করতে পারেন। বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা না পেলেও কেউ নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে পারেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর জন্য লিখেন, দাওয়াত হিসেবে কলম ধরেন তাদের ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা

নেই। ক্যারিয়ারে প্রতিষ্ঠা না পেলেও তারা সফল। মানুষকে ভালোর সন্ধান দিয়ে যেতে পারলেই তারা কামিয়াব। জাগতিক প্রতিষ্ঠা পেলে তা কেবলই বাড়তি পাওনা। কারণ, আখিরাতের তার পুরো বিনিয়োগ ফেরত পাবেন মুনাফাসমেত।

ইসলামে লেখালেখির ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। লিখতে হয় কলম দিয়ে। কলম নামে আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে একটি স্বতন্ত্র্য সূরাই নাযিল করেছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহীর সূচনায় নাযিল করা বাণীগুলোয়ও ছিল কলমের গুণগান। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ ﴾ [العلق: ١، ٤]

'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।' {সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১-৪}

সহীহ বুখারীতে সংকলিত হিজরতকালীন একটি ঘটনা থেকেও জানা যাচ্ছে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও কলম জিনিসটি কদর পেত। দীর্ঘ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এমন :

বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাকা ইবন মালেক ইবন জু‘শুম জনৈক ব্যক্তির কাছে রাসূল গমনের সংবাদ শুনে পুরস্কারের লোভে দ্রুতগামী ঘোড়া ও তীর-ধনুক নিয়ে রাসূলের পিছে ধাওয়া করল। কিন্তু কাছে যেতেই ঘোড়ার পা দেবে গিয়ে সে চলন্ত ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল। তখন তীর ছুঁড়তে গিয়ে তার পছন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদী কাফেলা অনেক দূরে চলে গেল। সে পুনরায় ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু এবারও একই অবস্থা হলো। কাছে পৌঁছতেই ঘোড়ার পা এমনভাবে দেবে গেল যে, তা আর উঠাতে পারে না। আবার সে তীর বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের মতই ব্যর্থ হলো। তার পছন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। তখনই তার মনে ভয় উপস্থিত হ’ল এবং এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, মুহাম্মাদকে নাগালে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তখন রাসূলের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। এ আহ্বান শুনে মুহাম্মাদী কাফেলা থেমে গেল। সে কাছে গিয়ে রাসূলকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ও আসবাবপত্র দিতে চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই গ্রহণ করলেন না। সুরাকা বলল, আমাকে একটি ‘নিরাপত্তা নামা’ লিখে দিন। তখন রাসূলের হুকুমে আমের ইবন ফুহায়রা একটি চামড়ার উপরে তা লিখে দিলেন। অতঃপর রওনা হলেন। [বুখারী : ৩৯০৬ সংক্ষেপিত]

সুরাকা ইবন মালেক ইবন জু'শুম আল-কেনানী যখন তার রাবেগ এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার মূল্যবান কংকন পরানো হবে? [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭/৬৯]

উহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফতকালে যখন মাদায়েন বিজিত হয় এবং পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও অমূল্য রত্নাদি তাঁর সম্মুখে আনা হয়, তখন তিনি সুরাকাকে আহ্বান করেন। তিনি তার হাতে কিসরার কংকন পরিয়ে দেন। এ সময় তাঁর যবান থেকে বেরিয়ে যায়-

الحمد لله، سوارَيْ ابن هرمز فى يدي سُراقة بن مالك بن جعشم أعرابى من بنى مدلج-

আল্লাহু আকবর! আল্লাহর কি মহত্ত্ব যে, সম্রাট কিসরার কংকন আজ বেদুইন সুরাকার হাতে শোভা পাচ্ছে।' [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭/৬৯]

এ ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, আপন দেশ ছেড়ে ব্যথিত চিত্তে মদীনায় হিজরতকালে কঠিন বিপদেও আল্লাহর নবী রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লেখার সামগ্রী

তথা কলমজাতীয় কিছু ছিল। যা দিয়ে সুরাকা বিন মালেকের সঙ্গে ওই চুক্তিপত্র লেখা হয়।

লেখালেখি তথা কলমের মাধ্যমে দাওয়াত বা মানুষকে সুপথে আহ্বানের মহৎ কর্মটি ব্যাপকতর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব কতটুকু তা বলাই বাহুল্য। আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে অনেক জায়গায় এ কাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অতএব আসুন আমি সফল লেখক হই না হই, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে এবং মানুষের মাঝে সত্য ও সুন্দরের আলো ছড়িয়ে দিতে কলম ধরি। নিজেকেও শামিল করি লেখক তথা দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ভাগ্যবান আলোকিত কাফেলায়। আল্লাহ আমাদের সকল সুন্দর প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।